স্বামীজীর ভাবগুলি মনন ও আত্মস্থ করো

স্বামী স্মরণানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরমপূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ *'Chew and Digest His Ideas'* বক্তৃতাটি করেছিলেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের প্রশিক্ষণ শিবিরে, ২০০২ সালে। স্বামীজীর ভাবাদর্শ সম্পর্কে সুখবোধ্য আলোকপাত করে এই বক্তৃতায় পূজ্যপাদ মহারাজ প্রসঙ্গত দেখিয়েছেন, বিশ্ববিজয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে আসার পর কীভাবে নতুন ভারতের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল; জাতির হাজার বছরের ঘুম কেমন করে ভেঙেছিল। স্বামীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের এই ১২৫ তম বর্ষে ফিরে তাকাই সেই মহাঘটনার দিকে। *Vivek-Jivan* পত্রিকার জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় ইংরেজিতে মুদ্রিত রচনাটি অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।

এই প্রবন্ধ এবং এই সংখ্যায় স্বামীজীর ভারত প্রত্যাবর্তন বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধগুলির শীর্ষে মুদ্রিত লোগোটি এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী **অনুপম মণ্ডল**।—সঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবসানের শতবর্ষ পরেও আমরা আজও তাঁকে নিয়ে চর্চা করে চলেছি। এই একশো বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, জগতে ভালমন্দ নানা ঘটনা ঘটেছে, বিশ্বে বহু পরিবর্তন এসেছে যেগুলি অনেক কুফলও নিয়ে এসেছে। স্বামীজীর সময়ে মোটরগাড়ি, বিশেষত বিদ্যুৎ এবং অবশ্যই মাইক্রোফোন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। শিকাগোতে যখন তিনি ছ-হাজার মানুষের সামনে বক্তৃতা করেছিলেন, তখন তাঁর সামনে মাইক ছিল না। বাহ্যদৃষ্টিতে জগৎ অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। দূরত্বকে মানুষ জয় করেছে। তুমি হাতে কেবল ফোন তুলে নেবে, আর দশ হাজার মাইল দূরে আমেরিকায় থাকা কারও সঙ্গে সেই মুহূর্তেই কথা বলতে পারবে, যেখানে এরোপ্লেনে উড়ে পৌঁছতে আঠারো থেকে কুড়ি ঘণ্টা লাগত। কিন্তু এই সবকিছু নিয়েও মানুষ অতীতে যা ছিল অথবা বর্তমানে যেমন আছে, তা-ই রয়ে গেছে। এমনকী পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ যেমন ছিল, আজও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সে এতটুকু বদলায়নি। আমাদের সবারই অন্তরে আছে প্রেম, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি আবেগ এবং অন্যান্য বহু অনুভূতি, যা আমাদের 'মানুষ' থেকে 'মনুষ্যত্ববান' করে তোলে। এগুলি আমরা বদলাতে পারি না। মাঝে মধ্যে মানুষকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা আমাদের ভিতরের

মানুষটার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। বাহ্য প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন, কিন্তু জড়বস্তুর প্রকৃতির গভীরে কিছুদূর প্রবেশের পরেই তাঁরা চিন্তা করে দেখেছেন : ''না, এইভাবে আমরা পরম সত্যের সন্ধান পাব না। আমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে''—''পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ/ তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্'' (কঠোপনিষদ, ২।১।১)। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তাদের প্রকৃতি অনুসারেই বহির্মুখী। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ তার দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সত্যস্বরূপ আত্মার সন্ধান পায়, যে-আত্মা জন্মমৃত্যুহীন, শস্ত্র দ্বারা আহত হন না—অক্ষত। সেই আত্মাই ব্রহ্ম, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ''—সকলের হৃদয়ে আমার নিবাস। অতএব এই আত্মাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আমাদের সকলের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র। শিশু কিংবা বৃদ্ধ, পুরুষ বা নারী—সকলের মধ্যে এক আত্মা বিরাজমান—'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬।১১)—তিনিই একমাত্র প্রভু। তিনি সকলের ভিতরে রয়েছেন। এই হল আমাদের প্রাচীন ঋষিদের বাণী, তাই তাঁরা আপন অন্তরে পরমসত্যের সন্ধানকেই অভীষ্ট লক্ষ্য বলে স্থির করেছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ঐহিক ও মানসিক শক্তিতে এতই সমৃদ্ধ হয়েছিল যে, অন্যান্য দেশের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। শেক্সপিয়র ভারতকে 'সোনার দেশ' বলে উল্লেখ করেছেন, আর সেই কারণেই দূরদূরান্ত থেকে ভিনদেশিরা ভারতে ছুটে এসেছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে—লুঠপাট, বাণিজ্য, আরও নানা কারণে। কিন্তু এদেশের উপর এক হাজার বছরের অন্ধকার নেমে এসেছিল, সমস্ত দেশকে তা এমনভাবে ঢেকে ফেলেছিল যে আমরা আমাদের সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম, সেই থেকে সবকিছুতে আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের পর চুয়ান্ন বছর আগে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু স্বামীজী তার অনেক আগেই এসেছেন এবং স্বামীজীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সমগ্র ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন, অধিকাংশই পদব্রজে। তিনি যেমন রাজা-মহারাজাদের গৃহে বাস করেছেন, তেমনই থেকেছেন দীন-দরিদ্রের কুটিরে। তিনি হিন্দুর অতিথি হয়েছেন, মুসলমানের ঘরেও থেকেছেন। তিনি ভারতাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। কন্যাকুমারীর শিলাসনে বসে গভীর ধ্যানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীত। তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছিল ভারতের পতনের কারণ এবং আগামী দিনে ভারতের পুনর্জাগরণের পথও। এর ফলে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ভারতের জন্য তাঁকে কী বার্তা দিতে হবে। কিন্তু তিনি এও অনুভব করেছিলেন যে, ভারত মরে যায়নি—গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে। তাকে জাগাতে হবে। কিন্তু কন্যাকুমারীর ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে, কেবল হাঁকডাকে এ-ঘুম ভাঙবে না। তাই তাঁকে যেতে হয়েছিল পাশ্চাত্যে, শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায়। সেখানে গিয়ে তিনি শোনালেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের এই বাণী—আমেরিকা তথা নতুন বিশ্বকে ও সেই বিরাট শহরে সমবেত নানা ধর্মের সকল মানুষকে, আর তার ফল হল দারুণ রোমাঞ্চকর।

যে-বিবেকানন্দ সেই বিশিষ্ট জনসভায় বক্তৃতা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন, তিনি আমেরিকায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সর্বত্র তিনি আমন্ত্রণ পেতে আরম্ভ করলেন। পরে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, যখন একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী পশ্চিমি দুনিয়ার বিদেশিদের কাছ থেকে এইভাবে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করবেন—বর্তমানে ভারত

যাদের পায়ের তলায় রয়েছে—কেবল তখনই ভারত জাগবে। বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী মহান ভারতীয় আচার্যরূপে স্বামীজী পরিচিতি লাভ করেছেন—এই সংবাদ আপামর ভারতবাসীকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। তিনি হয়ে উঠলেন নবভারতের জাগরণের অগ্রদূত। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর ১৮৯৭ সালে তাঁর স্বদেশে ফিরে আসার পর থেকেই নতুন ভারতের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। কিন্তু আগে যা বলেছি, ভারত অবনতির একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এই অবস্থা থেকে একে জাগ্রত করার দরকার ছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার—হাজার বছরের ঘুম ভাঙিয়ে দেশটাকে জাগ্রত করার—দেশের ও তার মানুষের উপর নেমে আসা অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে দেওয়ার একটি উপায়, একটি পথনির্দেশ দরকার হয়েছিল। স্বামীজী সেই চমৎকার উপায় বলে দিলেন, সেই পথটি দেখালেন। আমার তরুণ বন্ধুদের অনুরোধ করব, তারা যেন স্বামীজীর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতামালা পাঠ করে। ইংরেজিতে তো এটা পাওয়াই যায়, তাছাড়া ভারতীয় সব ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর এটি পড়া উচিত। বাংলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' ও হিন্দিতে 'ভারতমে বিবেকানন্দ' নামে বইটি পাওয়া যায়। এটি প্রত্যেকের পড়া উচিত। তিনি দেশটাকে 'মরণ হতে' জাগিয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁ যেমন বলেছেন, যিশু যেমন মৃত ল্যাজারাসের কবরের সামনে গিয়ে তাকে উঠে আসতে বলেছিলেন আর সে উঠে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই বিবেকানন্দ যেন ঘুমন্ত দেশটাকে ডাক দিলেন, ভারত প্রাণ পেল। ল্যাজারাস ছিল এক ভক্তের সন্তান। সে মারা গিয়েছিল, তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তারা যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছিল, ''প্রভু তুমি থাকলে ল্যাজারাসের মৃত্যু হত না!'' যিশু সেই কবরের সামনে গিয়ে ডাক দিলেন, ''ল্যাজারাস, ওঠো!'' অমনি ল্যাজারাসের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হল। ঠিক সেভাবেই স্বামীজী ভারত-আত্মাকে ডাক দিলেন (ভারত অবশ্য মৃত নয়, নিদ্রিত ছিল) : ''অনেক ঘুমিয়েছ তুমি! হাজার বছর ঘুমিয়েছ! এখন জাগ্রত হও!'' সেজন্যই তিনি কঠোপনিষদের সেই মন্ত্রের (১।৩।৪) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, ''উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত''—স্বামীজীর নিজের করা ভাবার্থ : "Arise, awake and stop not till the goal is reached"—ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না। লক্ষ্য কী? ভারতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করো। বারংবার তিনি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন এই বলে যে, ভারতের জাগতিক সম্পদ প্রয়োজন, জাগতিক অগ্রগতি প্রয়োজন, কিন্তু প্রতিটি পরিবর্তন, প্রতিটি সংস্কার, প্রত্যেকটি উন্নতির চেষ্টা ভারতের বুকে রূপায়িত হতে হবে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার

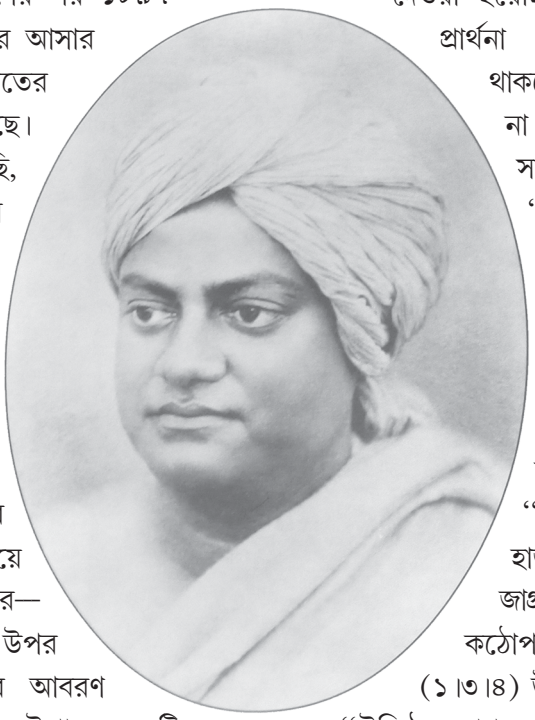

মাধ্যমে। কারণ এটিই ভারতের মেরুদণ্ড। এতেই লুকিয়ে আছে ভারতের রহস্য। তুমি যদি তোমার ধর্মকে যথাযথ বুঝে থাক, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তবে তুমি এই বাণী অনুসরণ করবে। আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ শুদ্ধতা, নিজেকে শুদ্ধ তথা পূর্ণ করে তোলা। অন্তরের দিব্যসত্তাকে জাগ্রত করা। অন্তর্নিহিত দিব্যস্বরূপ 'অবিদ্যা' (Ignorance) দ্বারা আবৃত থাকে, তাই আমরা সে-দিব্যসত্তাকে জানতে পারি না। ''অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'' (গীতা, ৫।১৫)। এই অজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানকে ঢেকে রাখে, মানুষ মোহাচ্ছন্ন হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। স্বরূপজ্ঞান প্রকাশের জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এই জীবনে অথবা পরে অন্য কোনও জীবনে লক্ষ্য প্রাপ্ত হলাম কী না, সেটা বড় কথা নয়। একবার যদি নিজেদের পূর্ণতা লাভের পথে চালিত করি, আমরা অগ্রসর হতে থাকব। আমরা হয়ে উঠব আদর্শ মানুষ। স্বামীজী এটাই চেয়েছেন। একেই স্বামীজী চরিত্র গঠন এবং মানুষ-তৈরির শিক্ষা বলেছেন।

ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর আমরা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা নকল করেছি, যা সেই থেকে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। আমরা ভেবেছিলাম, প্রাচীনকালে ভারতীয়রা যা কিছু করেছে, সেসমস্তই বাতিল করতে হবে। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনগুলি ছিল পশ্চিমি সভ্যতার দুর্বল নকল। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন ছোট গ্রাম কামারপুকুরে, সেই সময়ে কলকাতা থেকে সেখানে পৌঁছতে হলে তিন দিন লাগত। উল্লেখ করার মতো কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তিনি একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব এনেছিলেন বলা যেতে পারে, যার প্রধান সেনাপতি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি বলতেন, সর্বপ্রথম আমাদের সবল হতে হবে—দৈহিকভাবে বলশালী এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে,চাই 'লৌহসম পেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু'—এবং আমাদের নারী-পুরুষ উভয়কেই হতে হবে চরিত্রবান। এই পরিবর্তন আসা চাই। অতএব, আমাদের কী কর্তব্য?

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, ''শিক্ষার অর্থ কতগুলি তথ্য সংগ্রহ নয়।'' আমি তথ্য সংগ্রহ করব না, আজ তথ্য সংগৃহীত হয়ে কম্পিউটারের মেমারিতে রাখা হয়। আমাদের মস্তিষ্ককে অত্যধিক তথ্যের বোঝা চাপিয়ে ভারি করে তোলার দরকার নেই, যেকোনও মুহূর্তেই আমরা তা পেতে পারি। কিন্তু স্বামীজীর পদ্ধতি ছিল অন্যরকম। সেই সময়ে কমপিউটার ছিল না, কিন্তু মানব-কমপিউটারের ক্ষমতা অনেক বেশি। এর ক্ষমতা অনেক, এবং স্বামীজী বললেন—আমি জানি, মনকে কীভাবে বশে আনতে হয়। আমি মনকে একাগ্র করতে শিখব ও একাগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত মন দ্বারা যেকোনও তথ্য অনায়াসে লাভ করব। তিনি আর কী চেয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমাদের তরুণরা হবে আত্মবিশ্বাসী। তোমরা বল—আমি দুর্বল। তুমি নিজেকে দুর্বল ভাব আর সর্বদা দুঃখে কাঁদতে থাক, এরকম করলে চলবে না। তোমরা সিংহ। সিংহবিক্রমে উঠে দাঁড়াও। নিজেদের ভেড়া মনে কোরো না। যদি ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকে, অথচ নিজেদের উপর আস্থা না থাকে, তাহলে তোমরা নাস্তিক। স্বামীজী ধর্মের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন। বললেন, প্রাচীন ধর্ম অনুসারে, যে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, সে নাস্তিক। কিন্তু নবীন ধর্মবিশ্বাস বলে, সে-ই নাস্তিক, যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই। কী প্রবল আত্মবিশ্বাসী উক্তি!

অতএব তরুণ-তরুণীরা এই সমস্ত বিষয়গুলি ধারণা করবে এবং আত্মস্থ করবে, কারণ অভ্যাসের দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, ''আমি আমার মনকে একাগ্র করতে

পারছি না। এটা অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হচ্ছে। হাতের মুঠোয় বাতাস বন্দি করা এর থেকে সহজ বলে মনে হচ্ছে, মন বড়ই অস্থির।" ভগবান বললেন,

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"
(গীতা, ৬।৩৫)

—মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন করা প্রয়োজন।

কেউ জানে না, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কী ঘটে চলেছে! আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে গেছি, প্রত্যেকে কেবল নিজের কথাই ভাবে!

আর একটি বিষয় হল অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। কেউ কেউ ভাবে অতীত নিয়ে চিন্তা করা খারাপ, তা আমাদের দুর্বল করে ফেলে। মোটেই তা নয়। আমাদের অতীতের দিকেও তাকাতে হবে, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে—"চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্"—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আর এক পা সামনে বাড়ায়। এর অর্থ হল আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি আমরা গ্রহণ করব এবং সেইসঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে, কোথায় আমরা ভুল করেছিলাম এবং সেটি সংশোধন করে আমাদের এখন এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের সংশোধন করে নেওয়ার এবং প্রকৃত অগ্রগতির পথে নিজেদের চালিত করার এক বিরাট সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে। অগ্রগতি বা বিকাশকে কেবল গড় জাতীয় উৎপাদন (জি এন পি) দ্বারা বোঝানো যায় না। ওটা শুধুই একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। এমনকী ওটা অগ্রগতির একেবারে সঠিক সূচকও নয়। যখন দেশের প্রতিটি মানুষ, এমনকী দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্রতম ব্যক্তি দুবেলার খাবার পায়, ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ পায়, তার মাথার উপর কোনওরকম একটা ছাদ জোটে, কেবল তখনই সেই অবস্থাকে প্রকৃত অগ্রগতি বলা যেতে পারে। তা না হলে কেবল জি এন পি বৃদ্ধিকে প্রকৃত অগ্রগতি হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না।

তাহলে কোনটা আমাদের পিছনে টেনে রাখছে? কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে? এটা সত্যি যে, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি করেছে। আর সেই সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমরা পিছিয়েও পড়ছি। পিছিয়ে পড়ছি আমাদের স্বার্থপরতা ও দুর্নীতির কারণে। আমাদের এমন একটি সমাজ গঠন করতে হবে, যেখানে দুর্নীতি প্রায় থাকবেই না। আমি মানি যে, দুর্নীতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না, এমনকী প্রাচীন কালেও দুর্নীতি ছিল। কিন্তু এখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবলই দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম পরিস্থিতিতে দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতিই নয়—চরিত্রগঠন, মানুষকে সঠিক শিক্ষাদান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই অগ্রগতি না হলে স্বাধীনতার সুফল সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছবে না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যারা কুঁড়েঘরে বসবাস করে, তাদের কথা আমাদের ভাবতে হবে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল, যত সামান্য পরিমাণই হোক না কেন, এই কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করা।

যদি আমরা সর্বদা সাহায্যের আশায় অন্য কারও প্রতি বা সরকারের উপর নির্ভর করি, সেটা দুর্বলতা। যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল, আমরা সবকিছুর জন্যই ব্রিটিশ সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতাম। স্বাধীনতালাভের পরও আমরা আবার একইভাবে কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারি না। আমাদেরকেই কাজ করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই অনুভব করা উচিত যে, দেশকে যথার্থ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমারই। এই সমস্তই বাস্তবায়িত হবে, যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ গ্রহণ করি। আমি

ধর্মান্ধতামূলক কিছু বলছি না, কারণ স্বামীজী নিজেই বলেছেন—আমি আগামী পাঁচশো বছরের জন্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক দিয়েছি, তোমরা কেবল তা কাজে লাগাও। সেই খাবার গলাধঃকরণের চেষ্টা করো এবং হজম করে ফেলো। হজম করতে পারলে স্বামীজীর ভাব গ্রহণ করো। সেগুলি আত্মস্থ করতে পারলে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজজীবনে তথা জাতীয় জীবনেও বিরাট কিছু ঘটতে দেখবে। যখন এই দেশ জাগবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন বিশ্বের সকল দেশ আমাদের শ্রদ্ধা করবে। যতদিন আমরা দুর্বল হয়ে থাকব, কেউই আমাদের শ্রদ্ধা করবে না। যখন আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতাবান হয়ে উঠব, কেবল তখনই ওরা আমাদের সম্মান করবে।

স্বামীজীর অবদান বহুমুখী, তাঁর রচনা খুঁটিয়ে পড়লে তোমরা দেখবে যে, কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়েই নয়, তাঁর মানসলোক বিজ্ঞান, কলা, সংগীত, অর্থনীতি প্রভৃতি আরও কত দিক স্পর্শ করেছে। আমাদের অনেক গবেষণা করা দরকার। স্বামীজীর রচনায় ও বক্তৃতায় অনেক দূরদর্শী চিন্তাভাবনা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে তিনি অন্যতম, হয়তো বা একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ভারত তথা বিশ্বকে বিশদভাবে এবং সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং, তোমরা যদি কেবল স্বামী বিবেকানন্দেরই রচনা পড় তাহলে সমস্ত ইতিবাচক ভাবই লাভ করবে। এরপর সেই আদর্শের ছাঁচে জীবনগঠন করো, যেখানে কোনওরকম সংকীর্ণতা নেই।

সমগ্র মানবজাতির জন্য স্বামীজীর হৃদয় ছিল উন্মুক্ত। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন এবং পুরুষের জন্য ও নারীর জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী ডায়নামোর মতো, যা থেকে অত্যন্ত উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুদ্‌বাহী তারকে স্পর্শ করা যায় না। কাছে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। স্বামীজীর চিন্তাগুলি যেন সেই উচ্চমাত্রার বিদ্যুদ্‌বাহী তার। তাই তার ভোল্টেজ কিছুটা কমিয়ে নিতে হবে। এই কমিয়ে নেওয়া বা নামিয়ে আনার কাজটা করতে হবে আমাদেরই। তার অর্থ প্রত্যাখ্যান নয়, আমাদের ব্যষ্টিজীবন, তথা সমাজের সমষ্টিজীবনকে একটি বাস্তব গঠন দেওয়ার জন্যই এই উচ্চ ভাবপ্রবাহকে নিচে নামিয়ে আনা দরকার। আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

একই জিনিসের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানই হল অভ্যাস। অভ্যাস ক্রমে স্বভাবে পরিণত হয়। আর যখন স্বভাব পুনঃপুনঃ আচরণ করা যায়, তা হয়ে ওঠে চরিত্র, তোমার আপন প্রকৃতি। ভাল কিছু স্বভাবে পরিণত হলে তা অতি চমৎকার ব্যাপার। এটি তোমার নিজের জন্য যেমন ভাল, অপরের পক্ষেও কল্যাণকর। যদি মন্দ স্বভাব তোমার প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায়, তবে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রলোভনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বৈরাগ্য মানেই সন্ন্যাস নয়। যাঁরা সমাজে বাস করেন, তাঁদের স্বার্থপরতাকে কমিয়ে ফেলতে হবে। সেটাই বৈরাগ্য। সংসারীদের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। অতএব, সৎ চরিত্র গঠন করার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যই অনুসরণযোগ্য পন্থা। স্বামীজীর ভাব ও চিন্তারাশি হৃদয়ঙ্গম করা বা সামান্য উপলব্ধিও অশেষ কল্যাণকর। গীতায় ভগবান বলেছেন, ''স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'' (২।৪০)—ধর্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় থেকে রক্ষা করে। স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠ করলে তোমরা সবল হবে; সেই বলই তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করবে। তাই আমি অনুরোধ করছি, তোমরা সকলে স্বামীজীর রচনাবলি পড়ো, স্বামীজীর ভাবাদর্শ অভ্যাস ও অনুশীলন করো।